بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ মোতাবেক ২৫ তবুক, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত বেলাল (রা.)-র স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে আব্দুল্লাহ্ বিন বুরায়দাহ্ (রা.) নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন প্রত্যুষে মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, হে বেলাল! তুমি জান্নাতে আমার অগ্রে থাক, এর কারণ কী? গতকাল সন্ধ্যায় আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করি তখন আমি আমার সম্মুখে তোমার পদধ্বনি শুনতে পেয়েছি। হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, আমি যখনই আযান দেই তখন দু'রাকাত নফল নামায পড়ি আর যখনই আমার ওযু ভেঙে যায় আমি (আবার) ওযু করে নেই। আমি মনে করি, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার জন্য দু'রাকাত (নামায) পড়া আবশ্যক করা হয়েছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে এটিই কারণ হবে। অপর এক রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ফজরের নামাযের সময় হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণের পর তুমি সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক যে কাজ করেছ তা কী? কেননা আমি বেহেশ্তে আমার সম্মুখে তোমার পদধ্বনি শুনেছি। হযরত বেলাল (রা.) বলেন, দিনে ও রাতে যখনই আমি ওযু করেছি, আমি সেই ওযুর পর যতটা আমার জন্য সম্ভব ছিল অবশ্যই নামায পড়েছি। আমার দৃষ্টিতে এর চেয়ে আশাব্যঞ্জক আর কোন কাজ আমি করিনি, এটি বুখারীর হাদীস।

এর অর্থ এটি নয় যে, মহানবী (সা.)-এর চেয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন, বরং এর অর্থ হলো, পবিত্রতা ও গোপন ইবাদতের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই মর্যাদা দান করেছেন যে, জান্নাতেও তিনি সেভাবেই মহানবী (সা.)-এর সাথে রয়েছেন যেভাবে পৃথিবীতে ছিলেন। পূর্বের একটি রেওয়ায়েতেও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ঈদের দিন হযরত বেলাল (রা.) বর্শা হাতে মহানবী (সা.) এর সামনে হাঁটতেন এবং কিবলামুখী করে বর্শা গেঁড়ে দিতেন আর মহানবী (সা.) সেখানে ঈদের (নামায) পড়াতেন। যাহোক, তার পবিত্রতা এবং ইবাদতের কারণে আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতেও তার এই মর্যাদা বহাল রেখেছেন আর মহানবী (সা.) তাকে নিজের সাথে একটি দিব্যদর্শনে দেখেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, রাতের বেলা আমাকে যখন জান্নাত অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি পদধ্বনি শুনতে পেয়েছি। আমি বললাম, হে জিব্রাঈল! এই পদধ্বনি কার? জিব্রাঈল (আ.) বলেন, বেলালের। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হায়! আমি যদি বেলালের মায়ের গর্ভে জন্ম নিতাম, হায়! বেলালের পিতা যদি আমার পিতা হতো আর আমি বেলাল সদৃশ হতাম। কত উন্নত মর্যাদা সেই বেলালের যাকে এক সময়

তুচ্ছ জ্ঞান করে পাথরের ওপর টানাহ্যাঁচড়া করা হতো। হযরত আবু বকর (রা.) আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছেন যে, হায়! আমি যদি বেলাল হতাম।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) প্রাথমিক যুগের সাহাবীদের উল্লেখ করে একস্থানে এভাবে লিখেছেন যে, বেলাল বিন রাবাহ্ (রা.) উমাইয়্যা বিন খালাফ এর হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। হিজরতের পর মদিনায় আযান দেওয়ার দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত ছিল, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর তিনি আযান দেওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.)-র খিলাফতকালে যখন সিরিয়া বিজিত হয় তখন একবার হযরত উমর (রা.)'র অনুরোধে তিনি পুনরায় আযান দেন। (আযান শুনে) মহানবী (সা.)-এর যুগ সবার সামনে এসে যায়। অতএব তিনি স্বয়ং এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সাহাবীরা এত বেশি কাঁদেন যে তাদের হেঁচকি আরম্ভ হয়ে যায়। হযরত উমরের হযরত বেলালের প্রতি এত ভালোবাসা ছিল যে, যখন তিনি (রা.) মারা যান তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আজকে মুসলমানদের নেতা মৃত্যুবরণ করেছেন। এটি ছিল দরিদ্র এক হাবশী ক্রীতদাস সম্বন্ধে যুগের বাদশাহ্‌র উক্তি।

একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত-

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (সূরা কাহাফ: ৪৭)

এর তফসীর করতে গিয়ে হযরত বেলাল (রা.)-এর উল্লেখ করে বলেন, অবশিষ্ট কেবল একটি জিনিষই থাকবে, আর তা হলো, **আল বাকিয়াতুস্ সালেহাত**। আল্লাহ্‌র জন্য কৃত কর্মই অবশিষ্ট থাকবে। এরপর তিনি (রা.) বলেন, আজকে আবু হুরায়রা (রা.)-এর বংশধর কোথায়? বাড়িঘর কোথায়? কোন সম্পদ নাই, বংশধর নাই, আমরা জানি না কোথাও তার বংশধর আছে কিনা? কিন্তু আমরা যারা তাঁর বংশধরও দেখি নি, বাড়ি-ঘরও দেখি নি, সম্পদও দেখি নি; আমরা যখন তার নাম নেই, তখন আমরা বলি হযরত আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু তা'লা আনহু। তিনি (রা.) বলেন, কিছু দিন পূর্বে একজন আরব এসে বললেন, আমি বেলাল (রা.)-এর বংশধর। জানি না তিনি সত্য বলেছেন নাকি মিথ্যা; কিন্তু আমার তাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিল, কেননা তিনি সেই ব্যক্তির বংশধর যিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মসজিদে আযান দিয়েছিলন। আজ বেলালের বংশধর কোথায়? আমরা জানি না তাঁর (রা.)'র বংশ আছে কিনা; আর যদি থাকেও তবে তারা কোথায়? তাঁর বাড়ি কোথায়? তাঁর (রা.)'র কোন সম্পত্তি আমরা দেখি না। তাঁর সম্পত্তি কোথায়? কিন্তু তিনি (রা.) হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মসজিদে যে আযান দিয়েছিলেন সেই স্মৃতি আজও অম্লান এবং তা চিরদিন অমর থাকবে। এই পুণ্যগুলোই অবশিষ্ট থাকবে। হযরত বেলাল (রা.)-কর্তৃক চুয়াল্লিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহায়নে (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফ) ৪টি রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি রেওয়ায়েত হলো, মহানবী (সা.) বলেন, জান্নাত তিন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যকুল। তারা হলেন– আলী, আম্মার এবং বেলাল (রা.)।

একবার হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার সময় হযরত বেলাল (রা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এই যে বেলাল, তিনি হলেন আমাদের

নেতা। হযরত আবু বকর (রা.)'র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছিলেন, হযরত বেলাল (রা.) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত বেলাল (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, বেলাল আমাদের নেতা আর তিনি হযরত আবু বকর (রা.) কৃত পুণ্যকর্মগুলোর একটি, কেননা তিনি (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে ক্রয় করে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন।

হযরত আয়েয বিন আমর থেকে বর্ণিত, একবার হযরত সালমান, হযরত সুহায়েব এবং হযরত বেলাল (রা.)-র কাছে আবু সুফিয়ান আসেন, তারা এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তখন তারা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! খোদার তরবারি আল্লাহ্‌র শত্রুর ঘাড়ে যথাস্থানে আঘাত করতে পারে নি। বর্ণনকারী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি কুরায়েশের সম্মানিত ব্যক্তি এবং তাদের নেতা সম্পর্কে এমন কথা বলছ? তারা যখন বলছিলেন যে, আমরা সঠিকভাবে এদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেই নি- একথা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ভালো লাগে নি; তিনি বলেন, তোমরা কুরায়শের নেতা সম্পর্কে এমন কথা বলছ? এরপর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন এবং একথা জানান। উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! তুমি হয়ত তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে থাক তাহলে নির্ঘাত তুমি তোমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করেছ। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের কাছে যান এবং বলেন, হে আমার ভাইয়েরা! আমি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি। হযরত আবু বকর (রা.) এই চিন্তা করে মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়েছিলেন যে, তিনি তাদেরকে বকাঝকা করবেন বা বারণ করবেন, কিন্তু উল্টো মহানবী (সা.) বলেন, তুমি তাদের মনে কষ্ট দিয়েছ। এখানে আবু বকর (রা.)-এর মহান মর্যাদা দেখুন! তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেসব দরিদ্র লোকদের কাছে ফিরে যান এবং তাদেরকে বলেন, প্রিয় ভাইসকল! আমি তোমাদের মনে কষ্ট দিয়েছি? তারা বলেন, না না ভাই! আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি কৃপা করুন, এমন কিছুই ঘটে নি, আমাদেরকে আপনি অসন্তুষ্ট করেন নি বা মনে কষ্ট দেন নি।

হযরত আবু মূসা বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর পাশেই ছিলাম যখন তিনি (সা.) মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। হযরত বেলাল তাঁর সাথে ছিলেন; এক মরুবাসী মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি আমার সাথে কৃত আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করবেন না? মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন সে বলে আপনি অনেকবারই 'আবশির' তথা তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর বলেছেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত আবু মূসা এবং হযরত বেলালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যেমনটি কারো প্রতি কেউ অসন্তুষ্ট হলে মুখ ফিরিয়ে নেয় তেমনি তিনি সেই বেদুঈন থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি উক্ত দু'জনের দিকে মুখ করে বলেন, সে সুসংবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি তাকে সুসংবাদ দিচ্ছিলাম আর সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব, তোমরা দু'জন এই সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা উভয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা গ্রহণ করলাম। এরপর মহানবী (সা.) একটি পেয়ালা চেয়ে আনেন যাতে পানি ছিল। এই পানি দিয়ে তিনি তার উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং কুলি করেন। এরপর বলেন, তোমরা এটি থেকে পান কর এবং তোমরা উভয়েই নিজেদের মুখ ও বুকে এই পানি ঢেলে নাও এবং আনন্দিত হও। অতঃপর তারা দু'জনই সেই পাত্র হাতে নেন

এবং মহানবী (সা.) তাদেরকে যেভাবে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তারা করেন। পর্দার আড়াল থেকে হযরত উম্মে সালমা (রা.) তাদেরকে ডেকে বলেন, তোমাদের পাত্রে যা আছে তা থেকে তোমাদের মায়ের জন্যও কিছুটা রেখো, অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর জন্যও কিছুটা বাঁচিয়ে রেখো। ফলে, তারা উভয়ে তাঁর জন্য তা থেকে কিছুটা রেখে দেন।

হযরত আলী বিন আবি তালেব বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ্ তা'লা সাতজন করে নেতা বা অধিনায়ক দান করেন, আর আমি চৌদ্দজন অর্থাৎ দ্বিগুণ নেতা বা অধিনায়ক প্রাপ্ত হয়েছি। আমরা বললাম, তারা কারা? হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি, আমার দুই পুত্র, হযরত জাফর, হযরত হামযা, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত মুসআব বিন উমায়ের, হযরত বেলাল, হযরত সালমান, হযরত মিক্বদাদ, হযরত আবু যর, হযরত আম্মার এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)।

হযরত যায়েদ বিন আরকাম হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, বেলাল কতই না উত্তম মানুষ, সে সব মুয়াজ্জিনের নেতা। কেবল মুয়াজ্জিনরাই তার অনুসরণকারী হবে আর কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে দীর্ঘ গৃবাবিশিষ্ট হবে মুয়াজ্জিনরাই। হযরত যায়েদ বিন আরকাম হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, বেলাল কতই না ভালো মানুষ! শহীদ ও মুয়াজ্জিনদের নেতা তিনি, আর কিয়ামতের দিন হযরত বেলাল সবচেয়ে দীর্ঘ গৃবাবিশিষ্ট হবেন, অর্থাৎ তিনি অনেক বড় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে মহানবী (সা.) বলেন, জান্নাতের উটনীগুলোর মধ্য থেকে একটি উটনী বেলালকে দেয়া হবে আর তিনি তাতে আরোহন করবেন। হযরত বেলাল (রা.)-এর স্ত্রী বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমার কাছে এসে সালাম দিয়ে বলেন, এখানে বেলাল আছে কি? আমি উত্তরে বলি, না, আপনি ঘরে আসুন। মহানবী (সা.) বলেন, মনে হয় তুমি বেলালের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি বলি, তিনি আমাকে ভালোবাসেন আর কথায় কথায় বলেন যে, মহানবী (সা.) একথা বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একথা বলেছেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত বেলালের স্ত্রীকে বলেন, বেলাল আমার পক্ষ থেকে তোমাকে যে কথাই বলে তা অবশ্যই সত্য হবে আর বেলাল তোমার কাছে ভুল কথা বলবে না, তাই বেলালের প্রতি তুমি কখনোই অসন্তুষ্ট হয়ো না, অন্যথায় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোন কর্ম গৃহীত হবে না যতক্ষণ তুমি বেলালকে অসন্তুষ্ট রাখবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, বেলালের দৃষ্টান্ত মৌমাছির ন্যায়, যা মিষ্টি ফল এবং তিক্ত লতাগুল্ম থেকেও রস আহরণ করে, কিন্তু যখন মধু হয় তখন পুরোটাই সুমিষ্ট হয়ে যায় ।

হযরত বেলাল (রা.)-এর স্ত্রী বর্ণনা করেন, হযরত বেলাল (রা.) যখন বিছানায় শুতেন তখন দোয়া পড়তেন, **'আল্লাহুম্মা তাজাওয়ায আন সাঈয়েআতি ওয়াহ্যুরনি বেইল্লাতি'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমার ভুলত্রুটি মার্জনা কর আর আমার দোষত্রুটির বিষয়ে আমাকে অক্ষম মনে কর।

হযরত বেলাল (রা.)-এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) আমাকে বলেছেন, হে বেলাল! দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর আর সম্পদশালী অবস্থায় যেন মৃত্যুবরণ করো না। আমি নিবেদন করলাম দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করব আর সম্পদশালী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করব না– এ কথাটি আমি বুঝতে পারি নি, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমাকে যে রিয্ক দান করা হয় তা তুমি সঞ্চয় করে রেখো না আর যে জিনিসই তোমার

কাছে চাওয়া হয় তা দিতে তুমি অস্বীকৃতি জানিও না। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি যদি এমনটি না করতে পারি তাহলে কী হবে? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এমনই করতে হবে অন্যথায় ঠিকানা হবে জাহান্নাম। অর্থাৎ কোন ভিখারীকে খালি হাতে ফেরাবে না। এছাড়া এমন যেন না হয় যে, শুধু সঞ্চয় করবে আর ব্যয় করবে না। অর্থাৎ ব্যয় করাও আবশ্যক।

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে বিশ হিজরীতে সিরিয়ার দামেস্কে হযরত বেলাল (রা.) ইহধাম ত্যাগ করেন। কারো কারো মতে তিনি হালাব-এ মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ষাটের অধিক। কারো কারো মতে হযরত বেলাল ১৮ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। দামেস্কের কবরস্থানে বাবুস্ সগীরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-এর সম্মান ও পদমর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, (এর কিছু কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, কিন্তু কথার ধারাবাহিকতায় এখানে প্রথম দিকের কিছু কথা সম্ভবত পুনরায় চলে আসতে পারে) হযরত বেলাল (রা.) হাবশী (বা ইথিওপিয়ান) ছিলেন। তিনি আরবী ভাষা জানতেন না, আরবী বলার সময় অনেক ভুল করতেন। উদাহরণস্বরূপ ইথিওপিয়ার মানুষ 'শীন'-কে 'সীন' বলত। যেমন– বেলাল (রা.) আযান দেওয়ার সময় যখন 'আশহাদু'কে 'আস্‌হাদু' বলতেন তখন আরবের লোকেরা হাসাহাসি করত, কেননা তাদের মাঝে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা পাওয়া যেত। অথচ অন্যান্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ তারা নিজেরাও বলতে পারত না। যেমন– আরবরা রুটিকে রুটি বলতে পারে না, বরং রুতি বলে। তারা 'ট'–এর পরিবর্তে 'ত' বলবে এবং 'চুরি'কে বলবে 'জুরি'। কেননা তারা 'চ' বলতে পারে না, তাই 'জ' বলবে। তিনি (রা.) বলেন, যেভাবে অনারবরা আরবী ভাষার কিছু কিছু শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না, ঠিক একইভাবে আরবরাও অন্যান্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারত না, কিন্তু জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের নেশায় মত্ত হয়ে তারা একথা ভাবে না যে, আমরাও তো অন্যান্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারি না। মহানবী (সা.) বেলাল (রা.)-এর আস্‌হাদু বলায় অন্যদের হাসাহাসি করতে দেখে বলেন, তোমরা বেলালের আযান শুনে হাস? অথচ সে যখন আযান দেয় তখন আরশে আল্লাহ্ তা'লা আনন্দিত হন। তোমাদের আশ্‌হাদু অপেক্ষা তার আস্‌হাদু বলা আল্লাহ্ তা'লার নিকট অধিক প্রিয়। বেলাল (রা.) হাবশী বা ইথিওপিয়ান ছিলেন আর সেই যুগে ইথিওপিয়ানদের কৃতদাস বানানো হতো, বরং বিগত শতাব্দী তথা নিকটবর্তী শতাব্দীগুলোতেও দাস বানানো হয়েছে এবং আজ অবধি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হচ্ছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যাদের নিকট কোন ভিন্ন জাতি অভিশপ্ত ও লাঞ্ছিত গণ্য হতে পারে। মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে সকল জাতি আল্লাহ্ তা'লার সমান সৃষ্টি। গ্রীক এবং ইথিওপিয়ানদেরও তিনি সেভাবেই ভালোবাসতেন যেভাবে আরবদের ভালোবাসতেন। তাঁর কাছে কোন পার্থক্য ছিল না। আফ্রিকানরাও তেমনই প্রিয় ছিল যেমনটি ছিল আরবরা বা গ্রীকরা। এই ভালোবাসাই সেসব ভিন জাতির হৃদয়ে তাঁর (সা.) জন্য এমন ভক্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি করেছিল, যে বিষয়টি আরবের অনেক মানুষের জন্য অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না। তাঁর এই ভালোবাসার কারণেই সেসব লোকের হৃদয়েও মহানবী (সা.)-এর প্রতি এক গভীর ভক্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যাদের মাঝে বিচক্ষণতা ছিল না, যাদের সেই ভালোবাসার উপলব্ধি ছিল না এবং যাদের বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার ভেদ ও রহস্যের জ্ঞান ছিল না তারা বুঝতে পারত না যে, এটি কীভাবে হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কায় আরব জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, আবার আরবদের মাঝেও কুরায়েশ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছেন, যারা অন্যান্য আরব জাতিগুলোকে তুচ্ছ ও নীচ মনে করত। তাঁর গোত্র ছিল সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত গোত্র, ইথিওপিয়ানদের সাথে তাঁর কীইবা সামঞ্জস্য ছিল? মহানবী (সা.)-এর

কোন জাতি বা গোত্রের প্রতি ভালোবাসা থাকার হলে তা বনু হাশেমের প্রতি থাকা উচিত ছিল, তাঁর যদি কারো প্রতি ভালোবাসা থাকা বাঞ্ছনীয় হতো তাহলে কুরায়েশের প্রতি থাকা উচিত ছিল বা আরবদের প্রতি থাকা উচিত ছিল, কেননা তারা তাঁর স্বজাতি ছিল, এজন্য এসব মানুষেরও তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত ছিল। ভিন জাতির হৃদয়ে, যাদের সাম্রাজ্যকে তাঁর সৈন্য-সামন্তরা পদদলিত করেছিল, যাদের জাতীয় নেতৃত্বকে ইসলামি সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছিল (তাদের সাথে) কীভাবে ভালোবাসা হতে পারত? ভিন জাতিদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, তারা পরাজিত হয়েছে এবং তাদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের মাঝে এক গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। এটি কীভাবে সৃষ্টি হলো? তাঁর প্রতি তো তাদের শত্রুতা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবতা কী বলে? এর জন্য প্রথমে আমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর জাতির সেই ভালোবাসাকে কিছুটা খতিয়ে দেখি যা তাদের মনিবের প্রতি তাদের ছিল। তিনি অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) যখন গ্রেফতার হন তখন তাঁর বিশেষ শিষ্য পিতরকে, যাকে তিনি তাঁর পর খলীফাও মনোনীত করেছিলেন, সৈন্যরা জিজ্ঞেস করে, তুমি তার পিছনে পিছনে কেন আসছ, মনে হয় তুমিও তার সাথি? সৈন্যদের সন্দেহ হয় যে, তুমিও যেহেতু তার পিছনে পিছনে আসছ, তাই তুমিও তার সাথে যুক্ত আছ। তখন সে তাড়াতাড়ি বলে, আমি তার অনুসারী নই (ভয় পেয়ে যায়), আমি তো তাঁকে অভিসম্পাত করি। শুধু অস্বীকারই করে নি বরং অভিসম্পাত করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে তাঁর শিষ্যরা অবশ্যই ভালোবাসতেন। এমন লোকও হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারী বা শিষ্য ছিলেন যারা তাঁকে ভালোবাসতেন। পরবর্তীতে পিতরকেও রোমে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল আর তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মৃত্যুকেও বরণ করে নেন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ভালোবাসা ও আনুগত্যের কথা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-কে যখন শূলে চড়ানো হয় তখন তার ঈমান দৃঢ় ছিল না। তখন তো তিনি দু-চারটি চড়-থাপ্পড়কে ভয় পেয়েছেন, কিন্তু পরবর্তীতে শূলের মৃত্যুকেও তিনি সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন। যাহোক, এটি সেই ভালোবাসার একটি চিত্র ছিল যা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি তাঁর জাতির ছিল। এখন তাঁর জাতির বিপরীতে মহানবী (সা.) এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী দাসদের প্রতি যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখি যে, তারা তাঁরই হয়ে গেছেন। বেলাল একজন ইথিওপিয়ান দাস ছিলেন, তার প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে ভালোবাসা ছিল, তা আমরা একটু খতিয়ে দেখি। বাহ্যত কোন কোন মানুষের নিজ প্রিয়জনের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকে, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তাদের ভালোবাসা একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদেরকে দেখতে হবে যে, মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-এর প্রতি, হাবশী ক্রীতদাস হওয়ায় যাকে কেবল কুরায়েশরাই নয় বরং সমগ্র আরব পর্যন্ত ঘৃণা করত, (তার প্রতি) যে ধরনের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা কি কেবল সাধারণ উদারতার চেতনায় ছিল? উদারতা ছিল যে, ভালোবাসতে হবে, তার মনস্তুষ্টি করতে হবে, কেবল সেজন্যই ছিল, না-কি এটি সত্যিকার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল? এটি কি লোকদেখানো ভালোবাসা ছিল, নাকি প্রকৃত ভালোবাসা ছিল? হযরত বেলাল (রা.)-ই এটি পরীক্ষা করতে পারেন, আমরা নই। এর জন্য হযরত বেলালের কাছে যেতে হবে। এ ঘটনা ঘটার পর ১৩০০ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, আমাদের জন্য এটি যাচাই করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? দেখতে হবে, হযরত বেলাল (রা.) মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশকে কী মনে করেছেন। মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার ভালোবাসাকে হযরত বেলাল (রা.) কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন, তিনি এটিকে কী মনে করেছেন? এখানে প্রশ্ন এটি নয় যে, আমি নিজে কী মনে করি। এখানে প্রশ্ন এটি নয় যে, আমাদের পূর্ববর্তী শতাব্দীর লোকেরা কী বুঝেছে। এখানে প্রশ্ন এটি নয় যে, এর পূর্ববর্তী শতাব্দীর লোকেরা কী মনে করতেন, আর এখানে প্রশ্ন এটিও নয় যে, স্বয়ং সাহাবীগণ

কী বুঝেছেন। এসব কথা বাদ দাও যে, অন্যরা কী বুঝেছে বা মহানবী (সা.)-এর যুগের সাহাবীরা কী মনে করতেন। রবং আমাদের দেখতে হবে যে, স্বয়ং বেলাল (রা.) কী বুঝেছেন। প্রশ্ন হলো, মহানবী (সা.)-এর সেই ছোট্ট একটি বাক্য, ইতিপূর্বে যার উল্লেখ করা হয়েছে; তা হলো তোমরা তার আস্‌হাদু বলায় হাসাহাসি কর? অথচ তার আযান শুনে আল্লাহ্ তা'লাও আরশে আনন্দিত হন। তিনি তোমাদের আশ্‌হাদু অপেক্ষা তার আস্‌হাদুকে অধিক মূল্যায়ন করেন। এটি কেবল মনস্তুষ্টি ও উপেক্ষার ছলে ছিল, নাকি গভীর ভালোবাসার ভিত্তিতে ছিল? সাময়িকভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তিনি (সা.) কোন কথা বলেছিলেন, নাকি কোন গভীর ভালোবাসার কারণে বলেছিলেন যে, 'আশহাদু' থেকে 'আসহাদু' আল্লাহ্‌র নিকট অধিক পছন্দনীয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ কথায় বেলাল (রা.) কী বুঝেছিলেন? বেলাল (রা.) এ বাক্যের এ অর্থ করেছিলেন যে, যদিও আমি ভিন জাতির এবং এমন জাতির মানুষ যাদেরকে মানবতার গণ্ডি বহির্ভূত মনে করা হয় আর দাস বানানো হয়, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ভালোবাসা ও প্রীতি বিদ্যমান। বেলাল (রা.) এটি বুঝেছিলেন যে, ভিন জাতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আর এমন জাতির লোক হওয়া সত্ত্বেও যাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়, আমাকে তিনি (সা.) ভালোবেসেছেন এবং স্নেহ করেছেন। আমরা এ ঘটনার কিছুকাল পূর্বে গিয়ে দেখি, এই একই ব্যক্তি যিনি বলেন, مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সূরা আনআম: ১৬৩)। মহানবী (সা.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সূরা আনআম: ১৬৩) অর্থাৎ আমার মৃত্যুও আল্লাহ্‌র জন্য যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন, নতুন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, নতুন লোক সামনে আসে এবং নুতন পরিবর্তন সাধিত হয়। সময় অতিবাহিত হয়েছে, নতুন রাজত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনেক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। কতিপয় সাহাবী আরব থেকে শত শত মাইল দূরে চলে যান। সেসব সাহাবীদের মাঝে হযরত বেলাল (রা.)ও ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর এ সব পরিবর্তন ঘটলে তিনি (রা.) সিরিয়ায় চলে যান এবং দামেস্কে গিয়ে পৌঁছেন। একদিন দামেস্কে কিছু মানুষ একত্রিত হয়, সেখানে হযরত বেলাল (রা.)ও ছিলেন, আর তারা বলে, রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে বেলাল (রা.) আযান দিতেন। আমরা চাই, বেলাল (রা.) যেন পুনরায় আযান দেন। তারা বেলাল (রা.)-কে অনুরোধ করে, কিন্তু হযরত বেলাল (রা.) অস্বীকার করে বলেন, আমি এখন আযান দিতে পারব না। বেলাল (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর আমি আর আযান দিব না। কেননা যখনই আমি আযান দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করি তখনই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বরকতময় যুগ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই, এজন্য আমি আযান দিতে পারব না। বিষয়টি আমার সহ্যসীমার বাহিরে চলে যায়। হযরত উমর (রা.)ও তখন দামেস্ক-এ এসেছিলেন, ঘটনাক্রমে তিনি সেখানে সফরে ছিলেন। মানুষজন তাঁর অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-এর কাছে নিবেদন করে যে, আপনি বেলালকে আযান দিতে বলুন। আমাদের মাঝে এমন লোকেরাও রয়েছে যারা মহানবী (সা.)-কে দেখেছে আর বেলালের আযান শোনার জন্য আমাদের কান ছটফট করছে। সেই যুগ অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর যুগ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে, হযরত বেলালের আযান আমাদের কল্পনার জগতে ভেসে উঠে। আমরা বাস্তবেও একবার হযরত বেলালের আযান শুনতে চাই, যেন সেই যুগ আমাদের চোখের সামনে আরো ভালোভাবে ফুটে উঠে। আর আমাদের মাঝে তারাও রয়েছে, যারা মহানবী (সা.)-এর যুগ পায় নি, তাদের হৃদয়ের বাসনা হলো, সেই ব্যক্তির আযান শোনা, যার আযান মহানবী (সা.) শুনতেন এবং তিনি তা পছন্দও করতেন। হযরত উমর (রা.) বেলালকে ডাকেন এবং বলেন, মানুষ আপনার আযান শুনতে চায়। তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, আপনি যুগ খলীফা। আপনি চাইলে আমি আযান দিচ্ছি, কিন্তু আমি এটিও বলে রাখছি যে, আমার মাঝে তা সহ্য করার শক্তি নেই। অতএব হযরত বেলাল দাঁড়িয়ে

যান এবং সুউচ্চকণ্ঠে ঠিক সেভাবে আযান দেন যেভাবে তিনি মহানবী (সা.)-এর যুগে আযান দিতেন। আযান শুনে মহানবী (সা.)-এর যুগের কথা স্মরণ করে তাঁর আরব সাহাবীগণের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে আর কেউ কেউ চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। হযরত বেলাল আযান দিতে থাকেন আর শ্রোতাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর যুগের স্মরণে আবেগ ভিড় করতে থাকে। কিন্তু হযরত বেলাল, যিনি হাবশী ছিলেন, যার কাছ থেকে আরবরা সেবা গ্রহণ করেছে, আরবদের সাথে যার কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না, আর ভ্রাতৃত্ববন্ধনেরও সম্পর্ক ছিল না, আমাদের দেখতে হবে যে, স্বয়ং তার হৃদয়ে কী প্রভাব পড়েছে। উক্ত প্রভাব ছিল সেসব আরবদের ওপর প্রভাব, যারা মহানবী (সা.)-এর সমসাময়িক ছিল। তাদের সেই যুগের কথা স্মরণ হয়ে যায়। আর যারা সেই যুগের আরব ছিল না, তাদের সেসব কথা স্মরণ হয়ে যায় ও তারা আবেগ আপ্লুত হয়ে যায়, অথবা একে অপরকে দেখে তারা আবেগ আপ্লুত হন। কিন্তু হযরত বেলাল, যিনি আরবও ছিলেন না, উপরন্তু ক্রীতদাস ছিলেন, তাঁর ওপর এই আযানের কী প্রভাব পড়েছে (সেটি হলো দেখার বিষয়)। বলা হয়, তিনি (রা.) অর্থাৎ হযরত বেলাল আযান শেষ করার পর অজ্ঞান হয়ে পড়েন–এই প্রভাব পড়েছে তাঁর ওপর, আর কয়েক মিনিট পরই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এটি বিজাতিদের সাক্ষ্য ছিল মহানবী (সা.)-এর এই দাবির সত্যায়নে যে, আমার কাছে আরব এবং অনারবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এটি হলো সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। এই প্রেম ও ভালোবাসা, যা অনারব জাতিগুলো তাঁর (সা.) প্রতি প্রদর্শন করেছে। মহানবী (সা.) যে বলেছেন, আরব এবং অনারবদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই, এটি হলো তার সত্য ও ব্যবহারিক সাক্ষ্য, এটি হলো তার বহিঃপ্রকাশ। এটি ছিল বিজাতিদের সাক্ষ্য, যারা তাঁর ভালোবাসাপূর্ণ ডাক শুনেছে এবং এর যে প্রভাব তারা প্রত্যক্ষ করেছে, সেটি তাদের মাঝে এ বিশ্বাস সঞ্চার করেছে যে, তাদের নিজেদের জাতিও তাদেরকে সেভাবে ভালোবাসতে পারে না যেরূপভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে ভালোবাসতেন। ইনি ছিলেন আমাদের সৈয়্যদনা বেলাল, যিনি নিজের মনিব ও অনুসরণীয় নেতার প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার আর আল্লাহ্ তা'লার তৌহীদকে নিজ হৃদয়ে গ্রথিত করা এবং তার ব্যবহারিক প্রকাশের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা আমাদের জন্য অনুসরণীয় এবং পবিত্র আদর্শ। এছাড়া নিজের এই সেবকের প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা ও স্নেহের উপাখ্যানও পৃথিবীর আর কোথাও আমরা দেখতে পাই না। এটিই সেই বিষয় যা আজও প্রেম ও ভালোবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারে এবং দাসত্বের শৃঙ্খলকে ছিন্ন করতে পারে। সুতরাং আজও তৌহীদ প্রতিষ্ঠা এবং রসূলে আরব (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার উক্ত মানে উপনীত হওয়াতেই আমাদের মুক্তি নিহিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। হযরত বেলালের স্মৃতিচারণ আজ এখানে শেষ হচ্ছে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং তাদের (গায়েবানা) জানাযা পড়াব। তাদের মাঝে প্রথম স্মৃতিচারণ হলো, মোহতরম তৈয়ব ইয়াকূব সাহেবের পুত্র ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো-র মুবাল্লেগ মওলানা তালেব ইয়াকূব সাহেবের। তিনি গত ৮ সেপ্টেম্বর তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। শৈশব থেকেই তিনি ধর্মানুরাগী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ত্রিনিদাদের অধিবাসী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই পাঁচ বেলার নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী বইপুস্তক অধ্যয়নে তার প্রবল আগ্রহ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তিনি ব্রিটিশ ইন্সুরেন্স-এ চাকরি পান। কিন্তু 'ও' লেভেল করার পর ১৩ জানুয়ারি ১৯৭৯ সনে তিনি জীবন ওয়াক্ফ করেন এবং জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৮৯ সনে তিনি শাহেদ ডিগ্রি লাভ করেন। তার বিবাহ হয় ১৯৮৭ সনে কাদিয়ানের সাবেক

দরবেশ, নায়েব নাযেরে আ'লা মির্যা মুনাওয়ার আহমদ সাহেবের কন্যা মোকর্‌রমা সাজেদা শাহীন সাহেবার সাথে। তার স্ত্রী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত ভাই মির্যা বরকত আলী সাহেবের পৌত্রী। জামেয়া পাশ করার পর তার প্রথম নিযুক্তি বা পদায়ন হয় আফ্রিকার জায়েরে। সেখানে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ সন পর্যন্ত প্রায় তিন বছর তিনি সেবা করার সৌভাগ্য পান। এরপর ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত গায়ানা জামা'তে মুবাল্লেগ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য পান। অতঃপর সেখান থেকে তাকে ঘানার দুটো ভিন্ন অঞ্চল কোপেরেডুয়া ও কুমাসিতে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৯৭ থেকে ২০০৪ সন পর্যন্ত তিনি সেখানে কাজ করার সৌভাগ্য পান। সেখানে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুস্থ হবার পর তাকে ত্রিনিদাদে নিয়োগ দেয়া হয়, যেখানে ফ্রীপোর্ট জামা'তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে একান্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের কাছে তিনি ইসলামী শিক্ষা প্রচার করতে থাকেন। যেখানেই গিয়েছেন জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের সাথে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। জামা'তের সদস্যরা তার সাথে বিশেষ ভালোবাসার সম্পর্ক রাখত আর তিনিও তাদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। বিগত কয়েক বছর থেকে তিনি কিডনি বা বৃক্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। ডায়ালিসিসের জন্য সপ্তাহে তিনবার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে যেতে হতো, তথাপি জামা'তের কার্যক্রমে তিনি কোন বাধা আসতে দেন নি। অত্যন্ত মুত্তাকী, বিনয়ী, নরম প্রকৃতির, নম্রভাষী, ধৈর্যশীল ও অনুগত ছিলেন। সহনশীল প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। সবার সাথে সর্বদা হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। নামায ছাড়াও নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায, কুরআন করীমের তিলাওয়াত, রাতে শোয়ার পূর্বে আট রাকাত নফল আদায় করা তার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল। জামা'তী রীতিনীতি ও ঐতিহ্য অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলতেন। নিজ পরিবারকেও এসব পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নসীহত করতেন। নিজের পরিবারে সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছেড়ে যাওয়া আত্মীয়স্বজনের মাঝে তার স্ত্রী ছাড়াও একজন পুত্র নাসের ইয়াকূব এবং দুই কন্যা আমিনা ইয়াকূব ও আদিলা ইয়াকূব রয়েছে। তার দুই ভাই এবং তিন বোন রয়েছে। তাদের কয়েকজন ত্রিনিদাদে রয়েছে এবং কয়েকজন অস্ট্রেলিয়াতে রয়েছে। তার একজন ভাবি হেলেন ইয়াকূব সাহেবা বলেন, আমি ত্রিশ বছর পূর্বে বয়আত গ্রহণ করেছি। মওলানা সাহেব ত্রিনিদাদে আসলে সর্বদা অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে ধর্মের নতুন নতুন কথা আমাকে শেখাতেন। এর কারণে আমার ধর্ম শেখার আগ্রহ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। তালেব ইয়াকূব সাহেবের এমন আচরণের কারণেই আমার পুত্র তৈয়্যব ইয়াকূব আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মুরব্বী হবার নিয়্যত করেছে এবং এখন জামেয়া আহমদীয়া কানাডার দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষা গ্রহণ করছে। যেখানে তার চিকিৎসা চলছিল সেখানে একজন আহমদী চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। প্রত্যেক ডাক্তার ও নার্স, যারা তার চিকিৎসা করেছে, তার নৈতিক গুণাবলীতে খুবই প্রভাবিত ছিল। তিনি রোগাক্রান্ত ছিলেন, তার বসা অবস্থায় কেউ এসে গেলে এবং হাসপাতালে আসন সংকট থাকলে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে গিয়ে অন্যদের বসার সুযোগ করে দিতেন। রোগীদের জন্যও এবং ডাক্তারদের জন্যও এক অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। অন্য মানুষজনের

জন্যও এক অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগোর মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, একজন মুরব্বী ও মুবাল্লেগের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে সত্যিকার অর্থে গুণান্বিত ছিলেন। খিলাফতের আনুগত্যের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা অগ্রসর-অগ্রগামী ছিলেন; তার ঊর্ধ্বতনদের প্রতিটি কথা মান্য করতেন এবং যে দায়িত্বই তার ওপর অর্পণ করা হতো, সেটিকে যথার্থরূপে পালনের পূর্ণ চেষ্টা করতেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লা, তাঁর রসূল (সা.) ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। কুরআন করীম তিলাওয়াত ও তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়মিত ছিলেন।

ত্রিনিদাদের একজন মুরব্বী কাসেদ উরায়েচ সাহেব বলেন, ত্রিনিদাদে যখন আমার পোস্টিং হয় তখন মওলানা সাহেব শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন, আবার বয়সেও তিনি বড়; এই মুরব্বী সাহেব যুবক, দু'তিন বছর হলো কানাডা জামেয়া থেকে পাস করে সেখানে গিয়েছেন। তিনি বলেন, মাত্র কয়েকদিনের মাথায় মওলানা সাহেব পঞ্চাশ মিনিটের পথ পাড়ি দিয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্রসহ আমার সাথে দেখা করতে আসেন এবং অত্যন্ত স্নেহসুলভ ব্যবহার করেন। এরপর দু'তিন দিন পর পর ক্ষুদেবার্তা পাঠিয়ে বা ফোন করে আমার কুশলাদি জেনে নিতেন যে, নতুন নতুন এসেছ, তোমার অনেককিছু দরকার হতে পারে। সেইসাথে হয়ত তাকে বিভিন্ন উপদেশও দিতেন এবং বোঝাতেনও। ছোট-বড় সবার সাথে ভালোবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। সবসময় খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন এবং যুগ-খলীফার জন্য দোয়া করার নসীহত করতেন। তার মেয়ে লিখেন, আমাকে সবসময় বলতেন যে, পরীক্ষার পূর্বেও এবং সর্বদা সব কাজের জন্য যুগ-খলীফাকে দোয়ার জন্য লিখবে। স্থানীয় একজন আহমদী মুনীর ইব্রাহীম সাহেব বলেন, আমরা যখনই তবলীগের উদ্দেশ্যে কোথাও যেতাম, সবসময়ই মওলানা সাহেব উপস্থিত থাকতেন এবং তবলীগের দায়িত্ব বণ্টন করে নিতেন; কাউকে বলতেন, তুমি উত্তরে যাও, আমি দক্ষিণে যাচ্ছি, যেন অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে। তিনি সবসময় হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। তার সহকর্মী যুবক মুরব্বীরা এবং অন্যরাও একই কথা বলেছেন যে, জামা'তের উন্নতির জন্য এবং তবলীগের জন্য কেউ যদি সামান্য কোন কাজও করত, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন এবং তাকে অনেক উৎসাহ দিতেন। একথা প্রত্যেকেই লিখেছেন যে, তিনি সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন এবং মিমাংসাপ্রিয় মানুষ ছিলেন। ছাত্রজীবনে বন্ধুদের মাঝে কোন মনোমালিন্য দেখা দিলে, সবসময় মিমাংসা করিয়ে দিতেন এবং বলতেন, আমরা আহমদীই! আর কোন ভাইয়ের প্রতি মনে ক্ষোভ রাখা উচিত নয়। আমিও তাকে সবসময় হাস্যোজ্জ্বল দেখেছি। খিলাফতের প্রতিও অগাধ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল; আর যেমনটি আমি বলেছি, তার সন্তানরাও এটিই বলেছে যে, আমাদেরও এ কথাই বলতেন যে, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাক এবং নিয়মিত চিঠি লিখতে থাক।

একজন নতুন বয়আতকারী নারেশ সাহেব বলেন, আমি বিভিন্ন অ-আহমদী মসজিদে গিয়ে প্রকৃত ইসলামের সন্ধান করতাম। যখন আমি মওলানা তালেব সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন কোন যুক্তি-প্রমাণ শোনার পূর্বেই আমার মনমস্তিষ্কে খুব ভালো একটি প্রভাব সৃষ্টি হতে থাকে। সে কারণেই তিনি এরপর বয়আত গ্রহণ করেন। যাহোক, তালেব ইয়াকূব সাহেব

ওয়াক্‌ফের দায়িত্বও পূর্ণ নিষ্ঠা ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পালন করেছেন এবং কখনো কোন অজুহাত দেখান নি। এটি-ই বলতেন যে, যুগ-খলীফা যেখানেই নিযুক্ত করবেন সেখানেই কাজ করতে হবে; আর তিনি যদি কখনো আমাকে বলেন যে, তুমি পাকিস্তানে থাক, পাকিস্তানেই তোমার পোস্টিং, নিজের দেশে ফিরে যেও না, তাহলে আমি সেটির জন্যও প্রস্তুত আছি। কার্যত এর প্রস্তুতিস্বরূপ পাকিস্তানে অবস্থানকালে তিনি পাঞ্জাবী ভাষা শেখারও চেষ্টা করেন যে, যদি সেখানে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে পাঞ্জাবের লোকদের সাথে কাজ করতে হতে পারে; এজন্য তিনি পাঞ্জাবী ভাষা শিখতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার স্ত্রী-সন্তানদের সুরক্ষা করুন এবং তাদেরকে মরহুমের পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী জানাযা মুকাররম ইঞ্জিনিয়ার ইফতেখার আলী কুরায়শী সাহেবের যিনি সাবেক ওকিলুল মাল সালেস আর মজলিসে তাহরীকে জাদীদের নায়েব সদরও ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বেশ দীর্ঘ জীবন দান করেছেন। গত ৩ জুন তারিখে তিনি ৯৯ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ইফতেখার আলী সাহেবের পিতার নাম মমতাজ আলী কুরায়শী সাহেব। পেশাগতভাবে তিনি পশু চিকিৎসক ছিলেন। ইফতেখার আলী সাহেব ভারতের মিরঠে জন্ম গ্রহণ করেন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মিরঠেই অর্জন করেন। এরপর রোড়কির থমসন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-এ ভর্তি হন, যা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে, এবং ১৯৪৪ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্রাজুয়েশন সমাপ্ত করেন। ছাত্রজীবনেই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁর পিতা তখন আহমদী ছিলেন না। কিন্তু ইফতেখার কুরায়শী সাহেব স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি অধ্যয়ন করে গবেষণা শেষে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি তার ফুপা মুখতার কুরায়শী সাহেব ও তার পিতা মুন্সী ফাইয়ায আলী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের বাণী পেয়েছিলেন। ইফতেখার কুরায়শী সাহেব অধিকাংশ সময় পড়ালেখার প্রয়োজনে নিজ বড় চাচা তুরাব আলী সাহেবের কাছে থাকতেন। তুরাব আলী সাহেবও আহমদী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ফুপা মুখতার কুরায়শী সাহেব নিজ পিতার সাথে অধিকাংশ সময় উপশহর মিরঠের সারাবাহতে ইফতেখার আলী সাহেবের বড় চাচার কাছে আসা-যাওয়া করতেন। কুরায়শী ইফতেখার আলী সাহেব ঐ সকল পুণ্যাত্মাদের মাধ্যমে আহমদীয়াতের বইপুস্তক পেতেন আর দিল্লী জামা'তও ছোট ছোট লিফলেট প্রচার করত। ঐ সকল লিফলেটও ইফতেখার আলী সাহেব অধ্যয়নের জন্য পেতেন। ইফতেখার আলী সাহেব সফরে সেসব বইপুস্তক পড়ে ফেলতেন এবং নিয়ে নিজ পিতার হাতে তুলে দিতেন। ইফতেখার সাহেব যখন থমসন কলেজে ভর্তি হন তখন তার ফুপা মুখতার কুরায়শী সাহেব তাকে নিয়মিত পত্রযোগে ব্যাপক পরিসরে তবলীগ আরম্ভ করেন। ইফতেখার আলী সাহেবও বিস্তারিতভাবে সেসবের উত্তর দিতেন। সে যুগেও তার তাহাজ্জুদ আদায়ের এবং প্রাণঢালা দোয়া করার সুযোগ লাভ হয়, কিন্তু হৃদয়ে এক অস্থিরতা এবং ভীতি ছিল। একবার তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে হৃদয়ের এ অবস্থার কথা তুলে ধরেন এবং কিছু প্রশ্নও জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে হুযূর (রা.) লিখেন, আপনার প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত কিন্তু

পরিপূর্ণ, তাই এর উত্তর পত্রের মাধ্যমে দেয়া দুরূহ। আপনি আমার অমুক পুস্তকটি পাঠ করে নিন। ইফতেখার আলী সাহেব উক্ত পুস্তক তার ফুপা মুখতার সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে পড়া শুরু করেন। তিনি যতই তা পাঠ করতে থাকেন ততই নিজের প্রশ্নের উত্তর পেতে থাকেন। অবশেষে ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে পত্রের মাধ্যমে তিনি লিখিত বয়আত করেন। ১৯৪২ সালে তিনি কাদিয়ানের জলসায় আসেন আর কাদিয়ানের পরিবেশ দেখে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বক্তৃতাগুলো তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনেন এবং সেখানেও তিনি বয়আত করেন। এভাবে তিনি খলীফার হাতে হাত রেখে বয়আতের সৌভাগ্যও লাভ করেন। প্রত্যেক বছর তিনি কাদিয়ানের সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী'র সাথেও তিনি সাক্ষাতের সুযোগ পেতেন। মাথায় কোন প্রশ্ন থাকলে তিনি তা হুযূরের কাছে উপস্থাপন করে উত্তর জেনে ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হয়ে ফিরে যেতেন।

ভারতেই তিনি সরকারী চাকরি শুরু করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই চাকরি করেন। ১৯৫১ সালে হিজরত করেন। পাকিস্তানে সেচ ও এনার্জি বিভাগে চাকুরি করেন। সরকারী চাকরির সুবাদে বিভিন্ন শহরে তার বদলি হয়। তিনি খুবই সততার সাথে কাজ করেন। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার থেকে পদোন্নতির ধারায় তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার হন, বরং একবার কিছুকালের জন্য তাকে পাঞ্জাব সরকারের সেচ ও এনার্জি মন্ত্রনালয়ের সচিব পদেও অধিষ্ঠিত করা হয়, অর্থাৎ তিনি সচিব পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিলেন। খুবই সম্মান ও দক্ষতার সাথে নিজ দেশ পাকিস্তানের সেবা করার তার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৮৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন, কিন্তু এর পূর্বে ১৯৮০ সালে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) স্পেন সফর শেষে রাবওয়ায় ফিরে গিয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব আহমদীয়া আর্কিটেক্টস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারস' প্রতিষ্ঠা করেন তখন ইফতেখার আলী কুরায়শী সাহেবকে এর প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। সেই সময় তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন এবং পরে অবসরে যান। এরপর তিনি জীবন উৎসর্গ করার জন্য আবেদন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার ওয়াক্ফ মঞ্জুর করেন আর ১৯৮৩ সালে তার ওপর তাহরীকে জাদীদের ওকিলুল মাল সালেসের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। প্রথমে তাকে মনোনয়ন দেয়া হয় কিন্তু এরপর তিনি এ পদে যথারীতি নির্বাচিত হতে থাকেন। তিনি ১৯৮০ সাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় পঁচিশ বছর পর্যন্ত এই এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সময়েও তার বহু কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। যেমন বুয়ুতুল হাম্দ কোয়াটার নির্মাণ ছাড়াও রাবওয়ায় জামা'তী বিল্ডিং নির্মাণের তিনি সুযোগ পেয়েছেন। তিনি নির্মাণ কমিটির তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। এছাড়াও তাকে অন্যান্য প্রজেক্টের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়, যেমন– ফযলে ওমর হাসপাতাল, জামেয়া আহমদীয়া, খিলাফত লাইব্রেরী ইত্যাদি। একই সাথে তিনি ফযলে ওমর ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসাবে কাজ করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ২০০৭ সালে আমি তাকে মজলিস তাহরীকে জাদীদের নায়েব সদর নিযুক্ত করেছিলাম। তিনি খুবই বিশ্বস্ততা, একাগ্রতা ও ভালোবাসার সাথে কাজ করতেন। চারজন খলীফার যুগ তিনি দেখেছেন এবং সর্বদা সকল ক্ষেত্রে আনুগত্য ও

ভালোবাসা প্রদর্শনকারী প্রমাণিত হয়েছেন। স্বল্পভাষী ছিলেন আর সর্বদা নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন। ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী হিসাবে তিনি সাঁইত্রিশ বছর কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে তিনি কাজ করতেন, আমিও তার সাথে কাজ করেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুই পুত্র ও তিন কন্যা দান করেছেন। তার এক পুত্র স্থপতি এবং এক কন্যা মহিলা ডাক্তার। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে দয়া ও ক্ষমার ব্যবহার করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার পুণ্যসমুহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

তৃতীয় জানাযা রাজিয়া সুলতানা সাহেবার, যিনি মৌলভী হাকিম খুরশিদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ৮১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মরহুমা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী শায়খুল্লাহ্ বখশ সাহেবের কন্যা ছিলেন। যৌবনেই নামায-রোযায় কঠোরভাবে অভ্যস্ত ছিলেন। সারাজীবন সরলতা ও বিনয়ের সাথে অতিবাহিত করেছেন। খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তারা স্বামী হাকিম মৌলভী খুরশিদ আহমদ সাহেব সদর উমুমীর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। এ সময় তার বাসায় মিটিং, সভা প্রভৃতি হতো আর তিনি অতিথিদের আতিথ্য করতেন। মুকাররম মৌলভী সাহেবের ১৯৮৪ সালে আড়াই বছর আসীরে রাহে মওলা (আল্লাহ্‌র পথে বন্দি) থাকার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। এ সময়টি তিনি নিজ স্বামীর অবর্তমানে পরম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। কেবলমাত্র তা-ই নয় বরং দৈনিক বেশ কয়েকজনের খাবার প্রস্তুত করে জেলে পাঠাতেন এবং অতি গোপনে পুণ্যকাজ করতেন। বেশ কয়েকজন গরীব ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যয়ভার বহন করেছেন, কয়েকজন গরীব শিশুকে লালনপালন করেছেন। আপনপর সবাই এ কথা বলেছে যে, খুবই স্নেহশীলা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মরহুমা ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। তিনি এক কন্যাসন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা কাদিয়ানের নায়েব নাযের বায়তুল মাল মুহাম্মদ মনসুর আহমদ সাহবের পুত্র মুকাররম মুহাম্মদ তাহের আহমদ সাহেবের। ২৮ মে তারিখে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৫৭ বছর বয়সে কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম হায়দারাবাদের বাসিন্দা ছিলেন। জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান থেকে পাশ করার পর ১৯৮৯-২০২০ পর্যন্ত মোট ৩১ বছর জামা'তের বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেছেন। পুরোটা সময় জুড়ে তিনি অর্থ দপ্তরে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বায়তুল মাল আমদ দপ্তরে ৭ বছর, নেযামত মাল ওয়াকফে জাদীদ-এ ৯ বছর, ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল ও নায়েব নাযের মাল ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে ৩ বছর, নাযেম মাল ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে ৮ বছর এবং নায়েব নাযের বায়তুল মাল হিসেবে ২ বছর কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সরলমনা, মিশুক ও সহানুভূতিশীল একজন কর্মী ছিলেন। তিনি ভারতের প্রতিটি প্রান্তে প্রান্তে সফর করেছেন। আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জামা'তের সদস্যদের অবগত করেছেন এবং তাদেরকে এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার এসব সফর ও চেষ্টাপ্রচেষ্টার ফলে ওয়াক্‌ফে জাদীদের বাজেটও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে বৃদ্ধ পিতামাতা ছাড়াও তার স্ত্রী এবং দুই পুত্র

রয়েছে। মরহুম কাদিয়ানের কাযা বোর্ডের প্রধান মওলানা মুহাম্মদ করীম শাহেদ সাহেবের বড় জামাতা এবং কাদিয়ানের নাযেরে আ'লা ইনআম গৌরী সাহেবের মামাতো ভাই ছিলেন। মরহুমের এক ভাই কাদিয়ানে মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানসন্ততিকে সুরক্ষিত রাখুন।

পরবর্তী জানাযা হলো স্নেহের আকীল আহমদ-এর, যে-কিনা ইন্টারন্যাশনাল জামেয়া আহমদীয়া ঘানার শিক্ষক মির্যা খলীল আহমদ বেগ সাহেবের পুত্র। আকীল আহমদ পাকিস্তানে গিয়েছিল আর সেখানে গিয়ে তার yolk sac tumor ধরা পড়ে। স্বল্পকালের অসুস্থতার পর মাত্র ১৩ বছর বয়সে ঐশী তকদীরের অধীনে সে মৃত্যুবরণ করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ছোটকাল থেকেই সে বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত ছিল। নিজের চেয়ে কমবয়সী শিশুদের প্রতি যত্নবান, অত্যন্ত নেক এবং অনুগত ছিল। ঘানার মাদরাসাতুল হিফযে ৬ পারা হিফয করারও সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল তার। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতামাতা ছাড়া ২ বোন স্নেহের আদীলা ও শাকীলা রয়েছে। তারা দু'জনই ওয়াকেফাতে নও। তার পিতা মির্যা খলীল আহমদ বেগ সাহেব ঘানার ইন্টারন্যাশনাল জামেয়া আহমদীয়ায় দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পাচ্ছেন। জামেয়া আহমদীয়া ঘানার আরেকজন শিক্ষক নাসির আহমদ সাহেব লিখেন, আকীল আহমদ অত্যন্ত স্নেহের ও সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিল। তার সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আমার সবসময় মনে থাকবে। সে এক নিষ্পাপ ও অনুগত ছেলে ছিল। বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত এবং কুরআন করীমের প্রতি তার গভীর আকর্ষণ ছিল। রুটিনের পড়াশোনা ছাড়া সে গত বছর থেকে পবিত্র কুরআন হিফয করছিল। প্রতিদিন মাগরিবের নামাযের পর খাবার খেয়ে মসজিদে গিয়ে নিজের পাঠ রিভাইজ করত এবং স্কুলের কাজ শেষ করে প্রত্যহ কুরআন করীমের কিছু অংশ মুখস্ত করার পর ঘুমাতে যেত। সে বলতো, আমি বড় হয়ে মুরব্বী হয়ে জামা'তের কাজ করব। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার পিতামাতা ও বোনদের এই শোক সহ্য করার সামর্থ্য দান করুন।

বর্তমানে এখানে হাযের জানাযা আসে না। অনেকেই আমার নিকট গায়েবানা জানাযা পড়ানোর আবেদন করে থাকেন। তাদের সবার জানাযা জুমুআর দিন পড়ানো সম্ভব হয় না, কেননা এর জন্য বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। কেবল নাম পড়তে গেলেই অনেক সময় লেগে যায়। তাই মোটের ওপর আমি এখানে গুটিকতক ব্যক্তির জানাযা পড়িয়ে থাকি। যদিও আরো অনেকের আবেদন এসে থাকে। আমি তাদের সকলের নাম না নিয়েই বলে দিচ্ছি, যাদের জানাযা আমি এখানে পড়াই তাদের মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। যারা জানাযা পড়ানোর আবেদন করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের উত্তরসূরীদের ধৈর্য ও মনোবল দান করুন এবং তাদের পুণ্য সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। যাহোক, জুমুআর নামাযের পর আমি এই সমস্ত (মরহুমদের) গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)